(বনগ্রামের মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা)

কাল গিয়েছে পূর্ণিমা। বাংলো একটা বনাবৃত ছোট পাহাড়ের চূড়ায়, মধ্যে একটা উপত্যকা। যে দিক থেকেই দেখি নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলচূড়া ঘিরে আছে চারিদিকে। গভীর রাত্রে কাল জ্যোৎস্নাস্নাত অরণ্যে যখন ময়ূর ও সম্বর হরিণের ডাক শুনলুম, তখন সত্যই মনে হল কোথায় আছি? বন্য হস্তীর উপদ্রব সর্বত্র। যেখানে সেখানে হাতীর নাদ পড়ে আছে।

কাল বড় মজা হয়েচে। চা খেয়ে আমি, মিঃ সিংহ ও রেঞ্জ অফিসার মিঃ গুপ্ত তিন জনে বাংলো থেকে নেমে বনপথে বেড়াতে গেলুম হেঁটে। কি সুন্দর অপরাহ্ণের ছায়াবৃত সে অপূর্ব বনকান্তার! ময়ুর-নিনাদিত বনভূমি বাল্মীকির রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল দেখে মিঃ গুপ্ত বললেন, চলুন অন্ধকারে হাতী বেরুবে। যদিও পূর্ণিমা, কিন্তু এ বনে চতুর্দিকের শৈলমালা ভেদ করে চাঁদের আলো পড়তে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। এই একঘণ্টা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত বনের মধ্যে এক পাথরের ওপর বসে থাকা নিরাপদ নয়। এমন সময় মানুষের গলা শোনা গেল পায়ে চলা সরু পথটার প্রান্তে। যারা আসছে তারা আমাদের দেখে ভয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েচে। আমরা ডাক দিলুম, দুজন হো জাতীয় লোক। তারা বললে—বালজুড়ি থেকে চাল কিনে আসচি! হো ভাষায় বললে মিঃ গুপ্ত জানেন এভাষা। বালজুড়ি কোথায়? ওরা বললে, বোনাইগড় স্টেট। কখন বেরিয়েচ? বললে, বেলা দশটায় দক্ষিণ পশ্চিমে এই অরণ্যভূমির ওপারে উড়িষ্যার বোনাইগড় করদরাজ্য। সেখানে চাল ছ'সের টাকায়। লোকদুটি সেখানকার সীমান্তরক্ষীদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে বনে বনে পালিয়ে আসচে সস্তা চাল নিয়ে। আমাদের ভেবেছে সারান্ডা বনের সীমান্তরক্ষী। তাই এই ভয়।

কিন্তু কী অপূর্ব সৌন্দর্য হল পূর্ণিমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল সে বনভূমির। গম্ভীর অরণ্যানী, চতুর্দিকে পাহাড় আর বনাবৃত উপত্যকা। পদে পদে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রের ভয় সে সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেচে। চলে আসচি, গভীর বনে কুকুর ডাকার মত শব্দ। মিঃ গুপ্ত বললেন, ও কুকুর নয়, লোকালয় নেই, কুকুর কোথা থেকে আসবে? ও বার্কিং ডিয়ার, একপ্রকার হরিণ। কে বর্ণনা দিতে পারে এ জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমির? গভীর অরণ্যে দূরের কোন পার্বত্য নদীর অবিশ্রান্ত জলপতনধ্বনি ও ঝিঁঝি পোকা এবং নৈশ পাখীর কূজনদ্বারা বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর নৈঃশব্দ্য বর্ণনার জিনিস নয়, উপলব্ধি করার জিনিস। না দেখলে উপলব্ধি হবেই বা কেমন করে। বনের মধ্যে পাষাণময় তীরভূমির মধ্যে দিয়ে কোইনা নদী পার ধরে যাচ্চে, জ্যোৎস্নালোকে আজ আমরা সেখানে রাত্রে পিকনিক করতে যাব ঠিক হয়েচে।

এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ পর্বতশিখর শশাংদাবুরু ৩০৩৮ ফুট উঁচু। সারা সকাল ধরে বনের মধ্যে গিয়ে পরশু আমরা এই শিখরে উঠেছিলুম। অত্যন্ত দুরারোহ ও ঘন বনে আচ্ছন্ন সরু পথ দিয়ে উঠচি, উঠচি, তার যেন আর শেষ নাই। এক একটা শালগাছ কলের চিমনির মত ঠেলে উঠেচে আকাশে, কোথাও বন্য দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা, আরও কত কি বনকুসুম ফুটে আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে কে তাদের নাম জানে? কোথাও ঝর ঝর ঝরচে পাহাড়ী ঝরণা, শশাংদাবুরু শিখরদেশ থেকে খাড়া নিয়ে পড়চে, বনে বনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে শব্দ। কোথাও বনের মধ্যে বুনো রামকলা গাছ। কে খায় সে কলা হাতী আর বাঁদর ছাড়া। এই সারান্ডা অরণ্য অবিচ্ছেদে ৪০০ বর্গমাইল জনহীন, শুধু বন বিভাগের বাংলো ছাড়া কোন থাকবার জায়গা নেই, বনবিভাগের তৈরি মোটর রোড ছাড়া রাস্তা নেই। উঠতে উঠতে ঘন ঘন হাঁপাচ্চি, বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারচে, পা সামান্য তুলতেও কষ্ট হচ্চে। আবার বনের মধ্যে এত বেলাতেও সূর্যের আলো পড়ে নি, সে নিবিড়তা গাম্ভীর্যের তুলনা কোথায় ? ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম, সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে ফরেস্ট গার্ডকুড়ুল দিয়ে একটা আমলকী গাছের ডাল কাটলে। তখন দেখি অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েচি, কত নিচে উপত্যকা—দূরে দূরে শুধুই বননীল শৈলশিখর! যেদিকে চাই, পাহাড়, পাহাড় আর বন, বন! বড় বড় কেলিকদম্বের পাতা বিছিয়ে বসেচি খাড়া

বাঁকা পথটার গায়ে। গড়গড়িয়ে যদি পড়ি তবে ২০০ ফুট নিচু উপত্যাকার পাষাণময় ভূমিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে যাব। ওপরে উঠে গেলুম তখন বেলা দুটো। ওপরে উঠে দেখি—বারে, যেন খয়রামারির মাঠ! অনেকখানি সমতল মাঠ, দু মাইল লম্বা প্রায় দেড় মাইল চওড়া। বারে মজা! মাঠের মাঝে মাঝে কেলিকদম্ব, দেবকাঞ্চন ও শাল। এক জায়গায় একটা জলাশয়; তার তীরে নরম কাদায় বহু গরু মহিষের পদচিহ্ন। আমি বললুম, এখানে গরু চরে কাদের? রেঞ্জ অফিসার গুপ্ত হেসে বললেন, গরু কোথা থেকে আসবে এ জনহীন অরণ্যের ৩০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় ? ওগুলো বাইসন আর সম্বর হরিণের পায়ের দাগ। ফরেস্ট গার্ড হো জাতীয় বন্য লোক, সে সেসব পায়ের দাগ দেখে বললে, বুনো শূওর, বাইসন আর সম্বরের পায়ের দাগ। হাতীও আছে। বাঘ? বাঘ এখানে জল খায় না।

ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন। সঙ্গে খাবার নিয়ে উঠেচে দুজন ফরেস্ট গার্ড। এক পাথরে বসে পেট পুরে খেলুম। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে চা হল। ওঁরা তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, চলুন, বড় বাইসন আর হাতীর ভয়। আবার নামি সেই উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর থেকে নিম্নের ঘন বনের মধ্যেকার সরু দুর্গম পথ দিয়ে। ওঠাও যেমনি, নামতেও তেমনি। বেলা ৫টার সময় নিচে নামলুম বটে কিন্তু নামলুম কোথায় ? বনের মধ্যেই। বনের ছায়া নিবিড়তর হয়ে সান্ধ্য অন্ধকারে মিশিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েচে। ফরেস্ট গার্ড বলচে, হুজুর হাতী বেরুবে, জলদি চলুন। কিন্তু বললেই তো হয় না। আরও আড়াই মাইল হেঁটে তবে আমাদের মোটর পর্যন্ত পৌঁছব। মোটর পর্যন্ত পৌঁছতে সন্ধ্যা হল। হঠাৎ গার্ড বললে, হাতী! হাতী! চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের গায়ের বনে রাঙা ধুলো মাখা হাতী একটা গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে। তখন সন্ধ্যা, ভাল দেখা যায় না—কেউ বলে হাতী, কেউ বলে না। আমরা মোটরের ভেঁপু বাজাতেই দেখলুম রাঙা-ধুলো-মাখা জিনিসটি সরে গেল, সুতরাং নিশ্চয়ই হাতী।

শুক্লাচতুর্দশীর অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠল। তখন আমরা পার্বত্য কোইনা নদীর উপলাস্তীর্ণ তীরে পৌঁছে গিয়েছি। দু ধারের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে কলকল তানে কোইনা নদী বয়ে চলেচে। আমি বললুম চা খাওয়া যাক। চা আছে, চিনি আছে, দুধ নেই। আগুন করা গেল হাতীর ভয়ে। বাংলো আরও দু মাইল দূরে। ডালপালার আগুনে কেটলিতে জল চড়িয়ে দেওয়া হল। যেদিকে চাই, সেদিকেই ঝিল্লীমুখর বনানী। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণী ধ্যানমগ্ন ঋষিদের মত শান্ত সমাহিত—জন্ম-মরণভীতিভ্রংশী কোন্ মহাদেবতার উপাসনায় বিভোর। জয় হোক সে দেবতার, যাঁর করুণায় আজ আমার মত দরিদ্রের এ অপরূপ বনস্থলী দর্শনের সুযোগ ঘটল। তারই শব্দহীন বাণী এই বনানীর নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রহরে প্রহরে মুখরিত হয়ে উঠচে।